# তাপদাহ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব না পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড দায়ী?

**রিয়াজ উদ্দীন**

কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে তাপপ্রবাহ অতি উচ্চমাত্রায় রয়েছে। এবার তো তাপমাত্রা গত ৭৬ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। এর কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণকে দায়ী করছেন। আবার আরেকটি অংশ বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে গাছ কেটে উজাড় করার মতো পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডকে চাপা দেওয়া যাবে না। যদিও অবাধে গাছ কাটাও জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ প্রভাবের জন্য দায়ী।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অসহনীয় তাপপ্রবাহের কারণ যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেমনি রয়েছে গাছ কাটা ও অপরিকল্পিত নগরায়নের মতো পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। দুটি আসলে একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ ও বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার রঙবেরঙকে বলেন, 'তাপমাত্রা বাড়ার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নগরে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। প্রধানত বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় এ তিন কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে।'

১৯৯৫ সালের পয়লা মে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২৯ বছর পর আবারও তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রির সেই রেকর্ড স্পর্শ করলো। গত ২৯ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ছয় দশকে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী তিন দশকে তাপমাত্রা বাড়ার এই পরিমাণ ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। এমনটা মনে করছেন আবহওয়া ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক রঙবেরঙকে বলেন, '১৯৪৮ সাল থেকে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এবারের মতো তাপপ্রবাহ টানা আগে হয়নি। বলা যায়, ৭৬ বছরের রেকর্ড এবার ভেঙেছে।'

## চার কারণের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা

আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা এবারের তাপপ্রবাহের পেছনে চারটি কারণের কথা বলছেন। কারণগুলো হলো উপমহাদেশীয় উচ্চ তাপ বলয়, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, এল নিনোর সক্রিয়তা এবং বজ্রমেঘের কম সংখ্যা।

তাপমাত্রা বৈশ্বিকভাবেই ১ দশমিক ৩ ডিগ্রি বেড়েছে। তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। শৈলৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত কমে গেছে। এধরনের বৃষ্টিপাত হলে তা পাহাড় বা পর্বতে বাধা পেয়ে বায়ু ওপরের দিকে উঠতে থাকলে তা তাপ কমিয়ে শীতল হতে থাকে।

এছাড়া আরেকটি প্রভাব হলো এল নিনোর প্রভাব। এটি নিয়েই অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে। এল নিনোর পাশাপাশি লা নিনার নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান রঙবেরঙকে বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে আমরা নই। সেই হিসাবে এল নিনোর পরোক্ষ প্রভাব বাংলাদেশে আছে। যখন এল নিনো আসে তখন আমাদের অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বৃষ্টিপাত কমে যায়।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবুজ এলাকা ধ্বংসসহ তাপমাত্রা বাড়ার অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ন্ত্রণ না করায় এল নিনোর প্রভাব দৃশ্যমান। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উদ্যোগের পাশাপাশি বৈশ্বিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গবেষণা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বলছে, জলবায়ুর একটি ধরন এল নিনো। এটির মাধ্যমে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগার অঞ্চলের পানি উষ্ণ হয়ে পড়ে। এই উষ্ণ স্রোতের কারণে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী শীতল সামুদ্রিক স্রোতের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে স্থলভাগের তাপমাত্রা বাড়ে।

পূর্ব ও উত্তর গোলার্ধের দেশ বাংলাদেশে এখন এর প্রভাব দৃশ্যমান। এল নিনো এই অঞ্চলে উষ্ণ পানি ও শুষ্ক অবস্থা নিয়ে আসে। বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অবাধে গাছ কাটা, প্রকৃতি ধ্বংস করে অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশে মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়ে ধরা দিয়েছে এল নিনো। অন্যদিকে, এল নিনোর বিদায়ের পরে আসে লা নিনা যাতে শীতের প্রকোপ বাড়ায় একইভাবে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এল নিনো গড়ে প্রতি দুই বছর থেকে ৭ বছরের মধ্যে ঘটে। এবং প্রত্যেকবার সাধারণত ৯ থেকে ১৩ মাস স্থায়ী হয়ে থাকে। গত বছরে এপ্রিলে জলবায়ুবিদরা এল নিনোর ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

## ২২ বছরে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা কমেছে ১৩ শতাংশ

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট পরিচালিত প্ল্যাটফর্ম গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা কমেছে প্রায় ৬ লাখ ৭ হাজার ৬২০ একর। শতাংশের হিসাবে এটি ১৩ শতাংশ।

একটি দেশের পরিবেশ-প্রকৃতি ঠিক রাখতে অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার হলেও বাংলাদেশে মোট আয়তনের ১৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫০০ একর প্রাকৃতিক বনভূমি ছিল, যা মোট ভূমির ১৬ শতাংশ। প্রতিবছরই সেই বনভূমি কমছে। শুধু ২০২৩ সালেই বনভূমি কমেছে প্রায় ৪৪ হাজার একর। এই বিশাল এলাকার গাছগাছালি ধ্বংস না হলে অন্তত ৭৫ মেগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঠেকানো যেত।

ফরেস্ট ওয়াচের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা সবচেয়ে বেশি কমেছে চট্টগ্রামে; ৫ লাখ ৭০ হাজার ৫৭০ একর, যা মোট কমে যাওয়া বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার ৯৪ শতাংশ; এরপর যথাক্রমে আছে সিলেট, সেখানে কমেছে ২০ হাজার ৬৭৪ একর, ১৩ হাজার ৯৮০ একর, রংপুরে কমেছে ১ হাজার ১৯০ একর, রাজশাহীতে ৭৯৮ একর, খুলনায় ৫০১ একর, বরিশালে কমেছে প্রায় ২৪৫ একর।

গত ২০ বছরে চট্টগ্রাম অঞ্চল যে পরিমাণ বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা হারিয়েছে, তার ৭৬ শতাংশই বান্দরবান ও রাঙামাটিতে। এই সময়ে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা সবচেয়ে বেশি উজাড় হয়েছে বান্দরবানে ২ লাখ ৯ হাজার ৭৯২ একর। এছাড়া রাঙামাটিতে প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬১০ একর, খাগড়াছড়িতে ৬০ হাজার ৫৪১ একর, চট্টগ্রামে ২৩ হাজার ১০৪ একর ও কক্সবাজারে ২২ হাজার ৭৮৩ একর বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা ধ্বংস হয়েছে।

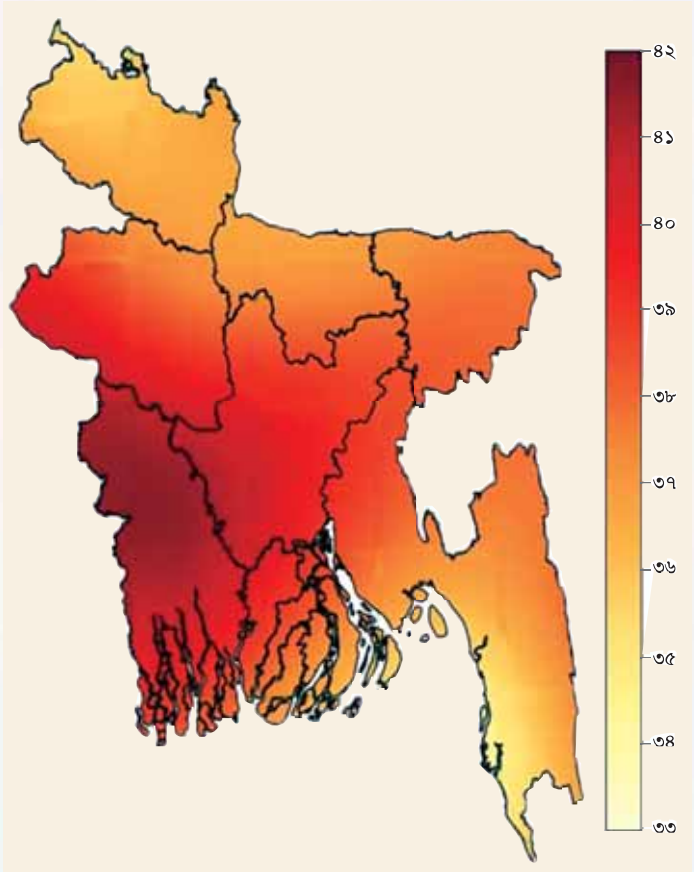


গবেষণায় চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে ২২ হাজার ৪৪৫টি স্থানে বৃক্ষ নিধন হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ফরেস্ট ওয়াচ। এসব এলাকায় প্রায় ৬২৯ একর বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা উজাড় হয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা সংস্থাটির। শুধু এপ্রিলের ১০ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিনে ৪ হাজার ৫৯৫টি স্থান নিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যার ফলে ১৩০ একর বন উজাড় হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের যেসব স্থানে বৃক্ষ নিধনের বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে চট্টগ্রামে। উজাড় হওয়ার শঙ্কায় থাকা ভূমির ৭২ শতাংশই (৪৫৬ একর) চট্টগ্রামের। বাদবাকি এলাকাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঢাকা। ঢাকায় ১২১ একর, সিলেটে ৩৭ একর, রংপুর ও খুলনায় প্রায় ৫ একর করে, রাজশাহীতে ২.৫০ একর এবং বরিশালে প্রায় ২ একর বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা উজাড় হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

## বনভূমি কমার কারণ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা বা বনভূমি কমে যাওয়ার পেছনে যেমন অপরিকল্পিত নগরায়ণ দায়ী, তেমনি দায় আছে জল, বায়ু ও মাটি দূষণ এবং নদী ভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক কারণ। যে হারে গাছ কমছে, সে হারে লাগানো হচ্ছে না; এটিও বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আবার লাগানো হলেও পর্যাপ্ত পরিচর্যার অভাবে অনেক গাছই মারা যায়।

নগর পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান রঙবেরঙকে বলেন, ‘অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ থেকে নগরের সম্প্রসারণ সবকিছুই গাছ উজাড় করছে। এরপরও আমাদের যে পরিমাণ জায়গা খালি আছে, সেসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো যায়।’

নদী ও পরিবেশ বিষয়ক সংগঠক অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ বলেন, ‘আমরা তো শুধু বৃক্ষ রোপণ করি। বরং গাছ লাগাই, গাছ বাঁচাই এভাবে করতে হবে। অর্থাৎ শুধু রোপণ করলেই হবে না, বরং পরিচর্যাও দিতে হবে। আরেকটা বিষয় হলো নদীভাঙন। প্রতিবছর নদী-ভাঙনের ফলে আমাদের প্রচুর গাছ-পালা কমে যায়। সেজন্য, আমাদের নদীগুলোও রক্ষা করতে হবে।’

## ঢাকার অবস্থা আরও শোচনীয়

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা শহরের সবুজ মাঠ, খোলা জায়গা ও পুকুর-খাল ধ্বংস করায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি অনুভূত হচ্ছে। রাজধানীর ৮২ ভাগ এলাকা কংক্রিটে আচ্ছাদিত হওয়াও তাপামাত্রা বাড়ার একটি কারণ।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি) মাঝে মাঝেই সবুজায়নের কথা বলে। দুই সিটি করপোরেশনই

ছাদবাগান করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। ছাদবাগান করলে ১০ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফের মতো প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছে সংস্থা দুটি।

তবে গাছ কেটে ছাদ বাগান করলে সেটি গাছের বিকল্প হয় কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াটার এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান। তিনি রঙবেরঙকে বলেন, 'অবাধে গাছ কাটা হচ্ছে। আর ছাদ বাগান করার কথা বলা হচ্ছে। একবারও তারা এটা বোঝার প্রয়োজন মনে করছে না যে ছাদ বাগান আদৌ গাছের বিকল্প হতে পারে কিনা।'

ভবন তৈরির নির্মাণ সামগ্রী এবং কাঠামোও তাপ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদরা। এ প্রসঙ্গে ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, 'বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পাশাপাশি ঢাকায় বেশি গরম লাগার স্থানীয় কারণ আছে। একটি নগরে সবুজ ২৫ ভাগ এবং জলাধার ১৫ ভাগ থাকতে হবে। কিন্তু ২০২০ সালে আমাদের এক গবেষণায় দেখেছি, ঢাকার মোট ভূমির শতকরা ৮২ ভাগ কংক্রিটে আচ্ছাদিত। ফলে এখানে তাপমাত্রা কমানো যায় না। সবুজ ও জলাধার থাকলে তিন-চার ডিগ্রি তাপ কমে যেত।'

এক প্রশ্নের জবাবে এই নগর পরিকল্পনাবিদ বলেন, 'পরিবেশের কথা মাথায় না নিয়ে এয়ারটাইট উঁচু উঁচু ভবন তৈরি করা হচ্ছে। সেগুলো কাচে ঘেরা। এগুলো তাপ উৎপাদন করে। ভবন নির্মাণে যেসব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোও তাপ উৎপাদন করে। এখন থেকে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা ও বিল্ডিং কোড মেনে চললে ২০ থেকে ৩০ বছরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।'

দুই সিটি করপোরেশন সবুজায়নে নানা প্রতিশ্রুতির কথা বললেও গাছ কাটার মতো ঘটনাও ঘটছে নিয়মিত। ফলে কার্যত তাপ কমার মতো পদক্ষেপ অনুপস্থিত বলে মনে করছেন পরিবেশবাদীরা।

এছাড়া রাজধানীতে বিলীন হতে বসেছে পার্ক-খেলার মাঠ। আয়তনের বিবেচনায় রাজধানীতে ন্যূনতম ৬১০টি পার্ক-খেলার মাঠ থাকা দরকার। কিন্তু আছে মাত্র ২৩৫টি। ঢাকার ৪১টি ওয়ার্ডে পার্ক-খেলার মাঠ একটিও নেই। বিশ্ব সংস্থা সংস্থার হিসাবে গত ২২ বছরে পার্ক-খেলার মাঠ কমেছে ১২৬টি। পার্কগুলো উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকারও নেই। এর ফলে হুমকির মুখে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, 'রাজধানীতে খেলার মাঠ নিয়মিতই কমছে। যেগুলো আছে সেগুলোও বেদখল। কর্তৃপক্ষগুলোও উদাসীন।'

## সামনে আরও বিপদ

এপ্রিল মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএসের এক গবেষণা সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ঢাকার ২০ শতাংশ স্থানে গাছপালা থাকা দরকার হলেও আছে মাত্র ২ শতাংশে। সমীক্ষায়

তুলনামূলক এক চিত্রে দেখা গেছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ এলাকায় গাছপালা ও ২২ শতাংশে জলাভূমি আছে। এ কারণে একই সময় ঢাকার চেয়ে সেখানকার তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা পার্ক এলাকার তুলনায় ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকায় তাপমাত্রা থাকে ২ ডিগ্রি বেশি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গাছপালা কমে যাওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে চিত্র, এটি বিপদের কেবল শুরু। আগামী দিনে এটি আরও বাড়বে। ভয়ানক খারাপ অবস্থা হবে। আমরা প্রকৃতিতে হাত দিয়েছি। সেটার ফল ভোগ করতে হবে। একটা গাছ বড় হলেই সেটা বিক্রি করে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে, এমন মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গাছের যে ইকোলজিক্যাল ভ্যালু আছে, সেটা চিন্তা করতে হবে।

বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের ২০১৭ ও ২০২৪ সালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার তাপমাত্রার তারতম্যের মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকায় দিন দিন তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে এলাকাভিত্তিক সবচেয়ে বেশি গরম বেড়েছে মহাখালী ও গুলিস্তানে।

অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলছেন, 'একটা নগরীর জন্য গাছপালা এবং জলাশয়ের একটা কুলিং অ্যাফেক্ট আছে। ২০ থেকে ৩০ বছর আগেও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ছিল স্বাস্থ্যকর শহর। এখনকার পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে একদমই অপরিকল্পিত নগরায়নে। ২০০০ সালে পরিবেশ আদালত আইন করেও এটা বাস্তবায়ন করা যচ্ছে না। গাছপালা কেটে, জলাশয় ভরাট করে একটা শ্রেণি হয়ত এসিতে স্বস্তিতে আছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সাধারণ মানুষকে এই এসি ব্যবহারের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমাদের সাধারণ উন্নয়ন মনস্তত্ত্বের মধ্যেও আমরা সবুজ এবং পানি রাখতে পারি নাই। আমাদের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে হবে। করে যেটা বেটার সেটাই করতে হবে। বিশেষ করে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা নতুন করে প্রস্তুত করতে হবে।'

## অসহনীয় তাপপ্রবাহের মধ্যেও অবাধে কাটা হচ্ছে গাছ

তাপদাহের মধ্যেই সড়ক উন্নয়নে ২ হাজার গাছ কাটছে রংপুর বন বিভাগ। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবাদীরা।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সামাজিক বনায়নের এক হাজার ৩৭৫টি গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। সামাজিক বনায়ন বিধিমালার নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে তীব্র গরমের মধ্যেই ৬ কিলোমিটার সড়কজুড়ে ছায়া দেওয়া ২৪ বছরের পুরানো এসব গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে। এতে ছায়া বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ, ঠিকানা হারাচ্ছে পাখ-পাখালি। কিন্তু গাছ কাটার এমন সিদ্ধান্ত কিংবা নিয়ম জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য শুভকর নয়; বলছেন পরিবেশবিদরা।

২০৪৪ গাছ কাটার সিদ্ধান্ত যশোর বন বিভাগের। এর প্রতিবাদ জানিয়ে উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে গাছ কাটার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য বন বিভাগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যশোর রোড উন্নয়ন ও শতবর্ষী গাছ রক্ষা কমিটি। তবে বন বিভাগ বলছে, এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার আপাতত কোনো সুযোগ নেই।

সারাদেশে গাছের জন্য হাহাকার, অথচ কুষ্টিয়ায় কেটে ফেলা হচ্ছে ৩ হাজার গাছ। এই গাছগুলোও কাটছে বনবিভাগ। দরপত্রের সমস্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

রাঙামাটিতে শতবর্ষী বটবৃক্ষ কাটতে চায় প্রশাসন। প্রতিবাদে বটতলাজুড়ে দিনভর অবস্থান নিতে দেখা গেছে মানুষকে। পূর্ব ট্রাইবেল আদামে বটগাছ কাটা নিয়ে এলাকাবাসী ও প্রশাসন এখন কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। এলাকাবাসীর বাধার মুখে বটগাছটি কাটতে পারছে না প্রশাসন। এলাকাবাসীর দাবি, বটগাছটি এলাকাবাসীর আবেগের সঙ্গে জড়িত। এর ছায়ার প্রতিদিন শত শত মানুষ আড্ডা দেন ও গল্প করেন।

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কাটা হয়েছে শতাধিক গাছ। আনোয়ারার রাঙ্গাদিয়ায় সিইউএফএলের আবাসিক এলাকার দক্ষিণ পাশে বীর মুক্তিযোদ্ধা

রুস্তম আলী সড়কের গাছ কাটেন স্থানীয় আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী খোকন নামের এক ব্যক্তি। এমনভাবেই যে কেউ যখন-তখন গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন।

গাছ কাটার বিষয়টি স্বীকার করে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী খোকন বলেন, 'এগুলো আমরা লাগিয়েছি এবং জায়গাটাও আমাদের। তাই আমরা কাটছি।'

ফরিদপুরে লেকের জন্য কাটা হচ্ছে ২৯টি গাছ। ইতিমধ্যে যার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। যেকোনো সময় গাছগুলো কাটা হবে। তবে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ১ হাজার ৭৬২টি গাছ লাগানো হবে।

উন্নয়নের নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ গাছ কাটার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দরপত্র থেকে জানা যায়, জীববিজ্ঞান অনুষদের সম্প্রসারিত ভবনের জন্য ৪৮ কোটি, গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদের সম্প্রসারিত ভবনের জন্য ৫৮ কোটি ও চারুকলা অনুষদের জন্য ৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান অনুষদ ও গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদের সম্প্রসারিত ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হচ্ছে আর চারুকলা অনুষদ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে।

টাঙ্গাইলে সড়ক সম্প্রসারণের জন্য গাছ কাটার উদ্যোগ নিয়েছে টাঙ্গাইল পৌরসভা। গাছ কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে একটি পরিবেশবাদী সংগঠন। যদিও পৌরসভার মেয়র এস এম সিরাজুল হক বলছেন, ক্লাব রোড সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ জন্য কয়েকটি গাছ কাটতে হচ্ছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদন নিয়ে কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক স্থগিত রাখতে বলেছেন। তাই গাছ কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে।

এপ্রিলের প্রথম দিকে নিলামের আগেই গাছ কাটা শুরু হয়ে যায় যশোরের অভয়নগরে। জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রউফ মোল্যা বলছেন, গাছ তিনটি সরকারি নয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন। জমির মালিক বাড়ি করছেন। একটি গাছের কারণে তার বাড়ির কাজ শেষ করতে সমস্যা হচ্ছে।

## জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে এল নিনো ও লা নিনার কথা

তাপপ্রবাহ-খরা ও অতিবৃষ্টি-বন্যার জন্য দায়ী যথাক্রমে এল নিনো ও লা নিনা। বর্তমানে অসহনীয় তাপপ্রবাহের কারণে জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে এল নিনোর কথা। বলা হচ্ছে এল-নিনোর প্রভাবেই প্রকৃতিতে এমন রিরূপ পরিস্থিতি, বদলে গেছে আবহাওয়ার খবর। অতিবৃষ্টি-বন্যা হয় তখন আলোচিত হয় লা নিনার কথা। এগুলোও আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

এল-নিনো আর লা-নিনো হলো স্প্যানিশ শব্দ। যার অর্থ হলো 'ছোট্ট ছেলে' আর অন্যটির অর্থ হলো 'ছোট্ট মেয়ে'। দু'জনই দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের বাসিন্দা। প্রায় ১০০ বছর আগে সেখানকার জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ওদের দেখতে পায়। সেই থেকেই তাদের এমন নামকরণ।

স্বভাবে একদমই বিপরীতধর্মী। এল-নিনো উষ্ণ, আর লা-নিনা শীতল। দু'জনের সঙ্গে সমুদ্রের গভীর সম্পর্ক। আসলে এল-নিনো এবং লা-নিনা হলো প্রাকৃতিকভাবে তৈরি একটি জলবায়ুর ধরন। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ক্রমাগত পরিবর্তন থেকে এদেরকে মূলত চিহ্নিত করা হয়।

এই দুই পরিস্থিতির সঙ্গে সমুদ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু তিনটি ধাপের মাধ্যমে একটি চক্র অতিক্রম করে। এই চক্রকে বলা হয় এনসো চক্র। এই তিনটি ধাপ হলো এল-নিনো, লা-নিনা; আর এ দুটি যখন প্রবল থাকে না, তখন তাকে বলা হয় এনসো নিউট্রাল।

এল নিনো হলো শুষ্ক মওসুম, যখন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কম বৃষ্টি হয় এবং বন্যাও কম হয়। এ সময় তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায়। আর লা-নিনার সময় বেশি বৃষ্টি আর বেশি বন্যা দেখা যায়। তাপমাত্রা কমে যায় স্বাভাবিকের চেয়ে।

বাংলাদেশ, ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার এল নিনোর প্রভাবটা কী? পুবালী বায়ু যখন পূর্বে না বয়ে পশ্চিমে বয়ে যায়, তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার–এই পুরো অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়। কারণ, বাতাসের প্রবাহ সমুদ্রস্রোতকে বয়ে নিতে থাকে পশ্চিম দিকে।

আর বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এসব অঞ্চলে দেখা দেয় বৃষ্টির অভাব। বেড়ে যায় তাপমাত্রা। শুকিয়ে যায় মাটি। এমনকি খরাও দেখা দিতে পারে।

আবহাওয়াবিদদের মতে, জলবায়ুর বিপুল পরিবর্তন সাধারণত এল নিনোর সময়ই দেখা যায়। আগামী কয়েক বছরে এল নিনোর প্রভাবে সারা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির হার আগের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দেবে।

*লেখক: রিয়াজ উদ্দীন, সাংবাদিক*